১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি: একটি পর্যালোচনা

ড. মর্ত্তুজা খালেদ
প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালী জাতির জীবনের সবচাইতে বড় একটি অর্জন। বিশ শতকের দ্বিতীয় শতক থেকে অবিভক্ত ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটা শুরু হয় ক্রমে তা তা সম্প্রসারিত হয়ে উপমহাদেশকে বিভক্ত করে। এভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধেও প্রথম যথার্থ প্রতিবাদ ছিল বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন থেকে পূর্ব বাংলায় ভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিকাশের সূত্রপাত ঘটে যার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে। এ আন্দোলনের চালিকাশক্তিও ছিল ছাত্রসমাজ কিন্তু ভাষা আন্দোলনকে সংগঠিত করা, এর স্বপক্ষে জনমত গঠন ও আন্দোলনে সুষ্ট নেতৃত্ব প্রদান করেছিল তদান্তীতন পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি। বস্তুত কমিউনিস্ট পার্টির সুযোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া হয়তো বা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ভিন্ন রকম হতো। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির এ ভূমিকার যথাথত ভুলায়ন হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধে এ সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির যথার্থ ভূমিকার একটি মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হলো।

পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিও ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের পটভূমি

১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় কোলকাতায়। ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত কলিকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে অখন্ড ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টিও দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। দেশ বিভক্ত হলেও তখন পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি অখন্ড ছিল। দেশ ও বিদেশ মিলে প্রায় হাজার প্রতিনিধি এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ভারত ও পাকিস্তানের অধিবাসীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। পাকিস্তান থেকে ১২৫ জন সদস্য কোলকাতার এ সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।[১] সম্মেলন শেষে পাকিস্তান থেকে যোগদানকারী প্রতিনিধিরা মিলে ৬ মার্চ আলাদাভাবে এক কংগ্রেসে মিলিত হয়ে গঠন করে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি।

ঐ একই দিন পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিরা পৃথকভাবে একটি প্রাদেশিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন এবং এর সম্পাদক নির্বাচিত হন খোকা রায়, অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেও মণি সিংহ, নেপাল নাগ, বারীন দত্ত, মনসুর হাবিব, কৃষ্ণ বিনোদ রায়, ফনী গুহ, নিরঞ্জন গুপ্ত, আলতাফ আলী, সুবীর চৌধুরী, বিভূতি গুহ, প্রমথ ভৌমিক, অবনী বাগচী, মুকুল সেন, মারুফ হোসেন, পূর্ণেন্দ দস্তিদার, ইয়াকুব মিয়া, আব্দুল কাদের চৌধুরী ও অমূল লাহিড়ী।[২] ভারততের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল বি টি রণদীভের বিপ্লবাত্মক সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন। রণদীভের থিসিসের আলোকে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির জন্য একটি রাজনৈতিক থিসিস এবং সংবিধান গৃহীত হয়। ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক ১৯৪৭-এ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে রণদীভের রিপোর্ট ও থিসিসে উপস্থিত বক্তব্য সেদিন পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করেছিল।[৩]

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি এ রাজনৈতিক লাইন বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করে সমগ্র পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলে তার মধ্যে অন্যতম ছিল মণি সিংহের নেতৃত্বে ময়মনসিংহের টঙ্ক আন্দোলন, সিলেট অঞ্চলের নানকার আন্দোলন এবং ইলা মিত্রের নেতৃত্বাধীন নাচোলের সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন।

১৯৫০ সালের শেষের দিক থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার সশস্ত্র বিপ্লবের রাজনৈতিক লাইন থেকে সরে আসা শুরু করে। ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে রাজেশ্বর রাও-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর সভায় নতুন জনগণতন্ত্রের রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক লাইন অনুসরণ করে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি মণি সিংহের নেতৃত্বে ১৯৫১ সালে এক গোপন সম্মেলনে মারাত্মক বামপন্থী বিচ্যুতি ঘটেছে স্বীকার করে নিয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দলিলের অনুরূপ রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করে।[৪] নতুন রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করার পরে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করে। আর পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রামের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।[৫] এ সময় পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ববঙ্গের ইস্যুভিত্তির রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠনে সচেষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় ১৯৫২ সালের ছাত্রদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টির কাছে নতুন এক রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠনের পটভূমি তৈরী করে দেয় ও কমিউনিস্ট পার্টি এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়।

ভাষা আন্দোলন শুরুর পটভূমি

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই বাংলার রাজনীতিবিদদের মধ্যে পাকিস্তানের শিক্ষার ভাষা হিসেবে বাংলার ব্যবহার করার আকাঙ্খার প্রকাশ দেখা দিয়েছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম ও মুসলিম লীগের ভিতরকার প্রগতিশীল অংশ ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় গণআজাদী লীগ নামের একটি রাজনৈতিক গ্রুপ গঠন করে "মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করিতে হইবে ... বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষাকে দেশের যথোপযোগী করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা হইবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।"[৬] ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র ও অধ্যাপকের উদ্যোগে তমদ্দুন মজলিস নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গঠিত হয়। এই সংগঠন বাংলা ভাষাকে শিক্ষার ও আইন-আদালতের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার পক্ষে প্রচার চালায়। তারা *পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা---না উর্দু?* শিরোনামের একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেন। ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর ঢাকাতে বিভাগপূর্ব আমরের অখন্ড বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, "উর্দুকে পূর্ব-বাংলার সরকারি ভাষা করা হবে না।"[৭] এভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে ও পরে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি আদায়ের উদ্দেশ্যে অনেক ফোরাম থেকেই দাবী উত্থাপিত হয়।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে করাচীতে শিক্ষা সম্মেলন হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয় উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আন্দোলন গড়ে তোলে। "রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যশ্রেণীর মধ্যে সরকারবিরোধী মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটে।"[৮] ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজীর সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ব্যবহারের দাবি উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটির বিরোধীতা করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান স্বয়ং। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাস থেকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকাসহ পূর্ব বাংলার সর্বত্র আন্দোলন গড়ে উঠা শুরু করে। ১১ মার্চ সারা বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট সংঘটিত হয়। ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ ২০০ আহত এবং ৯০০ জন গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে তৎকালীন পূর্ব বাংলার মূখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ পূর্ব বাংলা

সফরে এসে বিভিন্ন স্থানে তার বক্তৃতায় উর্দুকে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা করা হবে ঘোষণা করেন। তিনি নাজিমুদ্দিনের সাথে ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে যে চুক্তি হয়েছে তাতে অস্বীকার করেন। পরে ১৯৪৮ সালের ৬ এপ্রিল পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে তার স্বাক্ষরিত চুক্তি লংঘন করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি উপেক্ষা করেন।

এভাবে ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসের পর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন অনেকাংশে স্তিমিত হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ১৯৪৯ সাল থেকে পাকিস্থান সরকার শিক্ষা কার্যক্রমে আরবি হরফে বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা করা শুরু করে। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে গভর্ণর জেনারেল লিয়াকত আলী খান নিহত হবার পর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হন খাজা নাজিমুদ্দিন। ১৯৫২ সালের জানুয়ারী তিনি ঢাকায় এসে ঘোষণা করেন "পূর্ব বাংলার ভাষা কি হবে সেটা পূর্ব বাংলার জনগণই নির্ধারণ করবে। কিন্তু পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়।"[৯]

নাজিমুদ্দিনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদের সাথে যোগদান করে প্রগতিশীল বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনসমূহ। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সর্বদলীয় ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয় ও আন্দোলন পরিচালনার জন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি নাজিমুদ্দিনের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ের নিন্দা ও প্রতিবাদসহ ৪ ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাংলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহ্বান করে। সফলভাবে এ ধর্মঘট পালিত হয়।

ধর্মঘট শেষে ছাত্ররা এক সভায় মিলিত হয়। গাজীউল হকের সভাপতিত্বে এ সভায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট আহ্বান করা হয় ও সভা শেষে ১.৫ মাইল দীর্ঘ মিছিল নিয়ে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। ২০ ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাংলা গণপরিষদের অধিবেশনের তারিখ নির্ধারিত ছিল সেদিকে লক্ষ্য রেখে ধর্মঘটের এই তারিখ স্থির করা হয়েছিল।

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম থেকে কমিউনিস্ট পার্টি সক্রিয়ভাবে ভাষা আন্দোলনোর সাথে সংশ্লিষ্ঠ হয়। ২ ফেব্রুয়ারীতে তারা "বাংলা ভাষার অধিকার ও সকল ভাষার সমান মর্য্যাদা কায়েম করুন" শিরোনামে একটি লিফলেট প্রকাশ করেন। এতে বলা হয়,

> পাকিস্থানের বিভিন্ন ভাষভাষি জাতির ভাষা ও কৃষ্টিগত উন্নতির উপরই পাকিস্থানের সামগ্রিক উন্নতি ও সংহতি নির্ভর করে। পাকিস্থানের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতি যেমন---বাঙালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধি, বেলুচি---- প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনুযায়ী উন্নতি লাভ করুক, সমস্থ ভাষা যেমন---- উর্দু, বাংলা, পুস্থ, পাঞ্জাবী, সিন্ধি সমস্থ ভাষাকেই রাষ্ট্রে সমান অধিকার দেওয়া হোক্কইহাই পাকিস্থানবাসী সকল জাতির কাম্য। কিন্তু লীগ সরকার উর্দুকেই একমাত্র রাষ্টভাষারূপে চালু করার চেষ্টা করিয়া শুধু বাঙালীর অধিকার ও কৃষ্টির উপরই আক্রমণ করিতেছেন। ইহাতে পাকিস্থানের সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত হইবে। তাই 'বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা ও সকল ভাষার সম-মর্য্যাদা দান'--- পাকিস্থানের সকল ভাষাভাষি ব্যক্তির দাবী। এই দাবীর পিছনে বাঙালী-অবাঙালী সকল জনসাধারণকে সমবেত হওয়ার জন্য আমরা আহ্বান জানাইতেছি।[১০]

কমিউনিস্ট পার্টি আরও লিফলেট প্রকাশ করে এ আন্দোলনকে জোরদার করার চেষ্টা করে। ১১ ফেব্রুয়ারি তারা অপর একটি লিফলেট প্রকাশ করে রাষ্ট্রভাষার গুরুত্ব, পাকিস্থানের সকল জাতিসত্তার নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার অন্তর্ভূক্তির দাবি জানায়। এখানে বলা হয়, " 'বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা কর'---এই দাবী বাঙালী জাতির জাতীয় অধিকারের দাবী, এই দাবী বাঙালী জাতির জন্মগত অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবী। অতএব রাষ্ট্রভাষার আন্দোলয় বাঙালী জাতির জাতীয় অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।"[১১] এই লিফলেটে ২১ ফেব্রুয়ারী সাধারণ ধর্মঘট সফল করার জন্য সকলের প্রতি আবেদন জানানো হয়।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ দিনের জন্য শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। এভাবে ১৪৪ ধারা জারির ফলে পরিস্থিতির মধ্যে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রশ্ন দেখা দেয় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলন চালিয়ে চাওয়া হবে কি না? ২০ ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা বসে সেখানে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে করণীয় কি তা হয়ে দাঁড়ায় আলোচনার একমাত্র বিষয়। বৈঠকে সংগ্রাম পরিষদের অধিকাংশ সদস্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। অপর দিকে এই সংগ্রাম পরিষদের অন্তর্ভূক্ত কমিউনিস্ট যুব নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা করে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২১ ফেব্রুয়ারি সভা ও শোভাযাত্রা চালিয়ে যাবার পক্ষে বলেন।[১২] অনেক রাত পর্যন্ত এ আলোচনা চলার পরে তা ভোটে দেওয়া হয় ও সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে ভোট প্রদান করেন। এ অবস্থায় পরিষদের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ পরের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সভায় চূড়ান্তভাবে নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সভাকে প্রভাবিত করেন। এ বিষয়ে কমিউনিস্ট নেতা খোকা রায়ের বক্তব্য উল্লেখ্য, তার মতে,

> ২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার পর পার্টির কয়েকজন আন্ডার গ্রাউন্ড প্রাদেশিক নেতা ও পার্টির যুব, ছাত্র নেতাদের এক বৈঠক হয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার পরে সে বৈটকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ২১ তারিখ ছাত্র মিছিল করার জন্য একটি প্রস্তাব পার্টির ছাত্র নেতাদের পক্ষ থেকে পরের দিন ছাত্র সমাবেশে উত্থাপন করা হবে। সে প্রস্তাব সম্পর্কে ঐ ছাত্রসমাবেশ যে রায় দেবে পার্টির সব সভ্য ও কমী তা মেনে নেবে।[১৩]

এ ছাড়া ২০ কমিউনিস্ট পার্টি ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রা সফল করার আহ্বান জানিয়ে সাইক্লোস্টাইল করা এক ইশতেহার প্রচার করে। পরদিন অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রসভায় তা ছাত্রদের হাতে হাতে তুলে দেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে কমিউনিস্ট পার্টির এ আহ্বান ছাত্রদের প্রভাবিত করেছিল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে। এ ইশতেহারে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা, ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট সফল করার আবেদন রাখা হয়।[১৪]

২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনের ছাত্র সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে ক্যাম্পাসের বাইরে যাওয়া শুরু করে। ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ শুরু হয়। বেলা তিনটার দিকে পুলিশের গুলিবর্ষণে নিহত হন, সালাহউদ্দিন, আবুল বরকতসহ আরও একজন নিহত হন। ঐ দিনই কমিউনিস্ট পার্টি ভাষা আন্দোলনে নিহতদের প্রতিবাদে লিফলেট প্রকাশ করে সারা পূর্ব বাংলাব্যাপী ধর্মঘট ও আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। প্রকাশিত লিফলেটে বলা হয়, "নিজ মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যাহারা শহীদ হইয়াছেন তাহারা জাতির বুকে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। যে ঢাকা নগরী আমাদে প্রিয় শহীদদের খুনে লাল হইয়া উঠিয়াছে সেই ঢাকা নগরীর বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ নুরুল আমিন সরকারের বর্ব্বর হত্যাকান্ডের জবাব দিবার জন্য আগাইয়া আসুন।"[১৫] এই লিফলেটে আরও 'নিজ মাতৃভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবীতে প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রা অব্যাহত রাখার দাবী জানিয়ে আন্দোলনকে এগিড়ে নিয়ে যাবার আবেদন জানানো হয়।[১৬]

২১ ফেব্রুয়ারি বর্বর হত্যার নিহতদের উদ্দেশ্যে পরদিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে গায়েবি জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা শহরের হাজার হাজার মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করে। জানাজা শেষে উপস্থিত জনতা মিছিল করে যাবার পথে উত্তেজিত জনতা রথখোলার মোড়ে সরকার সমর্থক *দৈনিক সংবাদ* অফিসের দিকে অগ্রসর হলে সেখানে পাহারাবত পুলিশ মিছিলের গুলিবর্ষণ করে। এতে আট বছর বয়স্ক এক বালক নিহত হয়। এ ছাড়া ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে জনতা পুলিশ সংষর্ষে পাঁচজন নিহত ও পঞ্চাশের অধিক আহত হয়।[১৭] ২২ ফেব্রুয়ারির হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নেবার আহ্বান জানিয়ে পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারি কমিউনিস্ট পার্টি দুটি লিফলেট প্রকাশ করে। প্রথম লিফলেটের শিরোনাম ছিল

"শিশুহত্যাকারীদের বিরুদ্ধে একতার দুর্ভেগ্য প্রাচীর গড়ে তুলুন।" এতে বলা হয়, "শহীদদের পবিত্র স্মৃতি দেশবাসীর মনে চিরজাগরুক থাকবে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদের যে বীজ তারা দেশের মাটিতে বপন করে গেলেন জীবনের বিনিময়ে তা প্রত্যেক পাকিস্থানবাসীকে আগামী দিনের আজাদী ও গণতন্ত্রের সংগ্রামের নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে।"[১৮] দ্বিতীয় লিফলেটের শিরোনাম ছিল "সালাহউদ্দিন-জব্বার-বরকত-রফীকুদ্দিন প্রমুখ বীরদের হত্যার জবাব দিন। নুরুল আমিন সরকারের পদত্যাগ দাবী করুন।" এ লিফলেটে জনগণের প্রতি ঐক্যে আহ্বান জানানো হয়, বলা হয়, "আজ লীগ সরকারের পৈশাচিকতার সামনে দ্বিধা নয়, শংশয় নয়, অনৈক্য নয়। আজ শহীদগণের জীবনদান আমাদের সংকল্পকে আরও দৃঢ় করুন। শহীদদের রক্তের বন্ধনে সকল দল,সকল মতের নর-নারীর ভিতর গড়িয়া উঠুক অটুট ঐক্য।[১৯] সরকার দলীয় পত্রিকা *মর্ণিং নিউজ* ভাষাআন্দোলন সম্পর্কে মিথ্যাচার করে বিভিন্ন প্রচারণা শুরু করে। এ পত্রিকা ২১ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট সম্পর্কে তারা লিখে, "এ দিন শুধুমাত্র হিন্দুদের দোকানগুলি বন্ধ ছিল।" এবং ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তাদের অভিমত ছিল যে,ভারত থেকে ১০০ জন কম্যুনিষ্ট এসে এই আন্দোলন পরিচালনা করছে তারা সভা করে আন্দোলন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

তার জবাব দেবার জন্য পরদিন ২৪ ফেব্রুয়ারি কমিউনিস্ট পার্টি আরও একটি লিফলেট প্রকাশ করে তার জবাব প্রদান করে এভাবে, "বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের দ্বারা এই আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। আজ যাহারা শহীদ হয়েছেন তারা এই দেশেরই সন্তান। ---- সরকারের ভাড়াটিয়া 'মর্ণিং নিউজ' এদেরকেই বলেছে---গুন্ডা"।[২০]

পরদিন ২৫ ফেব্রুয়ারি আবার অপর একটি বিবৃতি প্রকাশ করে লিফলেটের মাধ্যমে, তাতে আন্দোলনকালীন গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার, গুলিবর্ষণের ঘটনার তদন্তের জন্য বেসরকারী তদন্ত কমিশন গঠন ও হত্যাকারীদের শাস্তি এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সরকারী কর্মচারীদের শাস্তি প্রদান না করার দাবী জানানো হয়। এতে আরও বলা হয়, "পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে জোরদার সর্ব্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করুন এবং যেসব কর্মী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছে তাঁহাদিগকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে সংঘবদ্ধ করুন।"[২১]

ভাষা আন্দোলন ক্রমান্বয়ে জোরদার হয়ে উঠে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় বাংলাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পাকিস্থান সংবিধান সভার কাছে সুপারিশ করে সরকারিভাবে প্রস্তাব পেশ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি প্রতিবাদ ও শোকসভার আয়োজন করে। দেশের বিভিন্ন শিল্প এলাকায় শ্রমিক ধর্মঘট পালিত হয়। সরকার আন্দোলন মোকাবেলায় দমণনীতি অনুসরণ করে। ভাষ আন্দোলনের সমর্থনে নারায়ণগঞ্জের মিছিলে পুলিশ আক্রমণ করে ও অসংখ্য লোককে গ্রেপ্তার করে। ১ মার্চ নারায়ণগঞ্জের অপর মিছিলে গুপ্তঘাতকের গুলিতে একজন পুলিশ কনস্টেবল নিহত হয়। সরকার তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ পরিবারকে দশহাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে হত্যাকান্ডের দায় কমিউনিস্ট ও ভারতীয় এজেন্টদের কাজ বলে প্রচার করে।[২২] ভাষা আন্দোলনের এই পর্যায়ে সরকার ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে। ৫ মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ আবারো প্রদেশব্যাপী হরতাল ডাকে। এ হরতাল ঢাকা শহরে ততটা সাড়া জাগাতে সমর্থ না হলেও দেশের অন্যত্র বিশেষত এ হরতাল সফলভাবে পালিত হয়। সরকারী নির্যাতন ও ৮ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হয়ে যাবার ফলে আন্দোলন স্থিমিত হয়ে পড়ে।

উপসংহার

ভাষা আন্দোলনকে কমিউনিস্ট পার্টি দেখেছিল পাকিস্থানের এক প্রদেশের স্বায়ত্বশাসনাধিকারের বিষয় হিসেবে। ভাষা আন্দোলনের সময়ে পূর্ব বঙ্গের কোন কোন অংশ দাবী তুলেছিল "একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বাংলা

চাই।" পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা বাংলা বলে এ দাবী অযৌক্তিক ছিল না। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি এ দাবী সমর্থন করে নি। বরং তার পরিবর্তে কমিউনিস্ট পার্টির দাবী ছিল "পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।"[২৩] কমিউনিস্ট নেতা খোকা রায়ের ভাষায়, "কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা পার্টির অভিমত ভাষা সংগ্রামের শরিক অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিকে ধৈর্য্য ধরে বুঝিয়ে ছিলেন।"[২৪] কমিউনিস্ট পার্টির ভাষা আন্দোলনের মধ্যে পাকিস্থান ভাঙ্গার কোন ইচ্ছা ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রচার-পত্রেই এই অভিমত প্রতিফলিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে,

> ইংরেজী বা উর্দু এই দুইটি ভাষার একটিকে, পাকিস্থানের বাঙ্গালী, পাঠান, সিন্ধি, বেলুচি প্রভৃতি সকল ভাষাভাষি জাতির উপর চাপাইয়া রাখাই (মুসলিম) লীগ সরকারের মতলব। কারণ পাকিস্থানের বিভিন্ন ভাষাভাষি জনগণকে নিজ নিজ মাতৃভাষঅয় শিক্ষালাভ ও রাষ্ট্র কার্য্য পরিচালনার সুযোগ না দিয়া সকল জাতিকে পশ্চাৎপদ করিয়া রাখা ও এই পশ্চাৎপদতার সুযোগে সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখাই হইল ভাষার প্রশ্নে লীগ সরকারের নীতি।25

এতে আরও বলা হয়, "পাকিস্থানের বিভিন্ন ভাষাকে রাষ্ট্রে সমান মর্য্যাদা দিতে হইবে।.....কোন ভাষাই অপর ভাষাভাষি জাতির উপর চাপানো চলিবে না।"[২৬] এভাবে দেখা যায় ভাষা আন্দোলন ছিল কমিউনিস্ট পার্টির কাছে এক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারের অধিকার বিশেষ এবং কমিউনিস্ট পার্টি মনে করেছিল এ আন্দোলন গণতন্ত্রীপন্থী। তারা পাকিস্থানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করার এক পদক্ষেপ হিসেবে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। সেটা আরও যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায় পঞ্চাশের দশকের পরবর্তী ঘটনাসমূহে কমিউনিস্ট পার্টির অংশগ্রহণের প্রকৃতি দেখে।

বাঙালী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটায়। ধর্মভিত্তিক কৃত্রিক এক জাতীয়তাবাদী ধারণার উপর ভিত্তি করে পাকিস্থান রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। ভাষা আন্দোলন সে রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে ফাঁটল ধরায়। এ দেশের অধিবাসী মাত্রই সচেতন হয় তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবন বোধ সম্পর্কে। ভাষা আন্দোলন বাঙালী মানসে পশ্চিম পাকিস্থানীদের সাথে তাদের সংস্কৃতির পার্থক্য সম্পর্কে সচেতনার সূত্রপাত ঘটায়। ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুস্থ ধারার চর্চাকে উৎসাহিত করে। পাকিস্থান সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব থেকে ধর্মকেন্দ্রীক ইসলামী ধারার চর্চার যে রীতি বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল ভাষআ আন্দোলন সে ধারায় বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করে। এ ছাড়া প্রতিক্রিয়াশীল মুসলীগ লীগ নেতৃবৃন্দ ইসলামের দোহাই দিয়ে বাংলা ভাষার যে বিকৃতির অপচেষ্টা চালাচ্ছিলেন ভাষা আন্দোলন প্রসূত একদল তরুণ সাহিত্যিক তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তাঁরা এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেন।

ভাষা আন্দোলনের আরও প্রত্যক্ষ ফলাফল ছিল তা রাজনৈতিক দল হিসেবে পূর্ব বাংলায় মুসলিগের জনপ্রিয়তায় ধস নামায়। পূর্ব বাংলার জনগণ ভাষা আন্দোলনে সরকারের ভূমিকা দেখে মুসলিম লীগ নুরুল আমিন সরকারের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তা যথার্থভাবে অনুভব করা যায় ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের বিপুল জনপ্রিয়তা ও নির্বাচনী বিজয় দেখে। আর বাঙালী জাতির ভাষা আন্দোলনভিত্তিক এ সকল অর্জনের পিছনে কমিউনিস্ট পার্টির অবদান ছিল অসাধারণ।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক, ১৯৩৮-১৯৬৮*, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬), পৃ.৭০।
[২] *ঐ*।
[৩] খোকা রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭০।
[৪] মণি সিংহ, ১২৯।
[৫] *ঐ*।

[৬] "আশুদাবি কর্মসূচি আদর্শ" গণআজাদী লীগ, (ঢাকা: পূর্ব পাকিস্থান পাবলিশিং হাউস), জুলাই ১৯৪৭, পৃ. ২২-২৩, উদ্ধৃত হয়েছে বদরুদ্দীন উমর, "ভাষা আন্দোলন" সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস,১৭০৪-১৯৭১,* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ),১৯৯২, পৃ.৪২৯।

[৭] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত,* পৃ.৪৩০।

[৮] ঐ, পৃ. ৪৩৩।

[৯] *ঞযব গড়ৎহরহম ঘবং,* ঔধহঁধৎু ২৮,১৯৫২ উদ্ধৃত হয়েছে বদরুদ্দিন উমর পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৩।

[১০] পাকিস্থানের কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি কর্তৃক প্রচারিত, "বাংলা ভাষার অধিকার ও সকল ভাষার সমান মর্য্যদা কায়েম করুন" ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সাল, উদ্ধৃত হয়েছে বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ,* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী) ১৯৮৪, পৃ.৫৭-৫৮।

[১১] পাকিস্থানের কমিউনিস্ট পার্টি, ই.বি.পি. ও.সি, পি ও সি সার্কুলার নং ১০, "রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন" তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি,১৯৫২ সাল, বদরুদ্দীন ইমর, *পূর্বোক্ত,* পৃ.২৫৯-৬২।

[১২] খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক,* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী,১৯৮৬) পৃ. ১১৬।

[১৩] *ঐ।*

[১৪] "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বানে সাড়া দিন" পূর্ববঙ্গ সাংগঠনিক কমিটি, পাকিস্থানের কমিউনিস্ট পার্টি, ২০ ফেব্রুয়ারি,১৯৫২ সাল, উদ্ধৃত হয়েছে, বদরুদ্দীন উমর, *পুর্বোক্ত,* পৃ.২৬৫।

[১৫] "অত্যাচারী নুরুল আমিন সরকারের বর্ব্বর হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে সারা পূর্ববঙ্গ ব্যাপী তুমূল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন।", পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি, পাকিস্থানের কম্যুনিস্ট পার্টি, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সাল।

[১৬] *ঐ।*

[১৭] বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১, *পূর্বোক্ত,* পৃ.৪৬০।

[১৮] "শিশুহত্যাকারীদের বিরুদ্ধে একতার দুর্ভেগ্য প্রাচীর গড়ে তুলুন। পাকিস্থান কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটির নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করেছেন।" পূর্ব্ববঙ্গ কমিটি, পাকিস্থানের কমিউনিষ্ট পার্টি, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, উদ্ধৃত হয়েছে বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ, কতিপয় দলিল, পূর্বোক্ত,* পৃ.২৬৭-২৬৯।

[১৯] "সালাহউদ্দিন-জব্বার-বরকত-রফীকুদ্দিন প্রমুখ বীরদের হত্যার জবাব দিন। নুরুল আমিন সরকারের পদত্যাগ দাবী করুন।"পূর্ব্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি, পাকিস্থানের কমিউনিষ্ট পার্টি, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, উদ্ধৃত হয়েছে বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ, কতিপয় দলিল, পূর্বোক্ত,* পৃ.২৭০-২৭২।

[২০] "পাকিস্থান কম্যুরিস্ট পার্টির পূর্ব্ব বংগ কমিটির নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করেছেন" ২৪ শে ফেব্রুযারী, পাকিস্থান কম্যুনিস্ট পার্টির পূর্ববংগ সংগঠনী কমিটি, উদ্ধৃত হয়েছে বদরুদ্দীন উমর উদ্ধৃত হয়েছে বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ, কতিপয় দলিল, পূর্বোক্ত,* পৃ.২৭৩-৭৪।

[২১] "সার্কুলার নং ১১" তারিখ ২৫/২/৫২, পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি, পাকিস্থানের কমিউনিষ্ট পার্টি, উদ্ধৃত হয়েছে বদরুদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত, পৃ,২৭৫-৭৬।

[২২] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, তৃতীয় খন্ড, (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন), জুলাই ১৯৯৫, পৃ.২৮১-৮২।

[২৩] খোকা রায়, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১১৮।

[২৪] *ঐ।*

[২৫] "ভাষা আন্দোলন" পি.ও.সি. সার্কুলার নং ১৩, ১৩.৪.১৯৫২ উদ্ধৃত হয়েছে বদরুদ্দিন উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ, কতিপয় দলিল, পূর্বোক্ত,* পৃ.২৮১।

[২৬] *ঐ।*

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন